

নাম: মো: নয়ন

জন্ম তারিখ: ৫ এপ্রিল, ১৯৯৮

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৯ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : কারচুপির কাজ করতেন,

শাহাদাতের স্থান : সুপারম্যাক্স হেলথকেয়ার লিমিটেড, ধানমন্ডি, ঢাকা

শহীদেদের জীবনী

”যে শ্রমজীবী ছেলে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেল,

ইতিহাস শুধু রাজনীতিবিদরা লেখে না “

নয়ন নামটি শুনতে যেন এক শান্ত জলের প্রতিধ্বনি, অথচ বাস্তবতায় সে ছিল ঝড়ের অনন্ত গর্জন। জন্ম ভোলার মাটিতে, এক ঘামজর্জর সংসারে। বাবা নূর ইসলাম, আজো ঢাকা শহরের ঘামে-বসা অলিগলিতে রিকশার প্যাডেলে পায়ের বল দিয়ে যুদ্ধ করেন; সেই যুদ্ধ থেমে থাকে না রোদে, না বৃষ্টিতে, না পুলিশের বাঁশিতে। মা মমতাজ বেগম, গৃহিণী, যাঁর জীবনের চারপাশে কেবল শাড়ির আঁচল, হাঁড়ির হাঁড়ি, আর ছেলেটির প্রতি গোপন গর্ব। নয়ন কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন না, ছিল না রাজনৈতিক পরিচয়, কোনো ব্যানার বা বুলেটিনে নাম লেখা ছিল না তবুও ইতিহাস তাঁকে টেনে নিয়েছে নিজের শিরোনামে।

নয়ন ছিলেন এক পোশাক শ্রমিক, নিউমার্কেট আর গাউছিয়া মার্কেটের মাঝের অন্ধকার গলিগুলোতে যাঁরা দোকানে দোকানে কাজ করেন, দিনের পর দিন খেটে যান। এক কাপ চায়ের দামও যখন ভাবনায় ফেলে, তখন নয়নের স্বপ্ন ছিল “মেয়েটাকে স্কুলে পাঠাবো।” স্ত্রী আরজু বেগমের চোখে ছিল একটি ছোট ঘরের আশা যেখানে রান্নাঘরটা আলাদা হবে, জানালায় একটু বাতাস আসবে। নয়ন ভাবতেন, “এই শহরে একদিন আমিও কাউকে ঠিকানা দিতে পারবো-নয়ন, বাড়ি নম্বর এত, গলি এত।”

তাঁর সংসারে সেই স্বপ্নের আভা ছিল, কিন্তু উপার্জনের হাত ছিল একটাই নয়নের নিজের। দুই ভাই হাসনাইন আর মহসিন তাকিয়ে ছিল বড় ভাইয়ের দিকে, যেমন মাটির শুকনো গায়ে চেয়ে থাকে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা। নয়ন ছিলেন সেই প্রথম ফোঁটা জীবনের পিপাসায় বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাস।

জুলাই বিপ্লবের সেই উত্তাল দিনগুলোয় নয়ন রাস্তায় ছিল না কোনো মিছিলে, কিন্তু তবুও গুলির মুখে পড়েছিলেন। পেছনে তাকালে দেখা যাবে না তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্চে বা মাইকে। তাঁকে দেখা যাবে দোকানের কর্নারে দাঁড়িয়ে, কাজ খুঁজছেন। অথচ এই কাজ খোঁজার মাঝেই গুলিটা এসেছিল এই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবজ্ঞার, তা যেন বলে উঠেছিল: “তোমার জীবনের দাম নেই।”

কিন্তু এই অবজ্ঞাই তো ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি। নয়ন, যিনি কোনো মিছিলে ছিলেন না, তাঁর রক্ত আজ মিছিলের পতাকা। তাঁর লাশকে কেউ কাঁধে নেয়নি বিপ্লবী স্লোগানে, কিন্তু মাটি তাকে আজ শহীদেদের কবরের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি যে মারা গেছেন, তা নয় তিনি যে ছিলেন, তা আমরা বুঝি এখন, যখন চোখে পড়ে তাঁর ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীর নিঃশব্দ কান্না, তাঁর মেয়ের অচেনা স্কুলব্যাগ, বাবার আজো চলতে থাকা রিকশা।

নয়ন ছিলেন পরিচিত না-থাকা এক বাঙালি এমন একজন, যার নাম কেউ উচ্চারণ করত না। আজ তাঁর নাম নেই নিউজে, নেই কোনো স্মারকফলকে, কিন্তু বাংলার গণঅভ্যুত্থানের কালি এখন তাঁর রক্তে লাল।

নয়ন আজ কবরের ভিতর চূপ করে শুয়ে আছেন। তবু তাঁর নীরবতা, আমাদের রক্তচাপ বাড়ায়। তাঁর গল্প বলা শেষ নয়, কারণ যে জাতি তাঁকে চিনেছে মৃত্যুর পর, তারা ভুলে যেতে পারে না সহজে। নয়নের পরিচয় এখন একটি প্রশ্ন: “এই দেশে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই কি মৃত্যুর অপেক্ষা?”

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট বাংলাদেশের রক্তাক্ত দিনপঞ্জির পৃষ্ঠাগুলো যেন হঠাৎ আগুনে জ্বলে ওঠে। একসময়কার নির্জন ক্যাম্পাস, হতাশ ক্যান্টিন, নীরব লাইব্রেরি সব গলে গিয়ে মিশে যায় রাস্তায়, স্লোগানে, শ্বাসরুদ্ধ গর্জনে। গুলিটা ছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে যেন ক্ষুদ্র এক কুঁড়ির মতো, অন্ধকার জমিনে ফুঁড়ে ওঠা প্রতিবাদের ডাক। কিন্তু রাষ্ট্রের নিঃশব্দ ঔদ্ধত্য আর পুলিশের রক্তচক্ষু সেই কুঁড়িকে ফুল নয়, রক্তফোয়ারায় পরিণত করল।

বেকার যুবকদের অবজ্ঞা, ভোটের নামে প্রতারণা, গুম-গ্রেপ্তার-নিপীড়নের দীর্ঘ শ্বাস সব মিলে জনগণের স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। একনায়কতন্ত্র, যার দেহ পঁচে গিয়েছে, কিন্তু খোলসে এখনো শক্ত, তার বিরুদ্ধে নেমে এসেছিল এই প্রজন্ম। তারা বই রেখে হাতে তুলে নিয়েছিল পোস্টার; কলমের কালি বদলে গিয়েছিল চোখের জল আর গলায় আটকে থাকা আত্মনাদে। ঢাকার বাতাস শুধু ধুলায় নয়, এখন ছিল বারুদের গন্ধে ভরা। মিছিলে প্রথমে আসেনি অনেকে, কিন্তু সবাই টের পেতে লাগল এই লড়াই আর শুধু কোটার নয়, এটা অস্তিত্বের, এটা নিঃশ্বাস ধরে রাখার বিরুদ্ধে নিঃশেষ চিৎকার।

নয়নের মতো অনেকেই মিছিলে ছিল না, তবু তারা মিছিলের ভেতর ছিল। নয়ন দাঁড়িয়েছিলেন নতুন লালবাগ থানার পাশে, তুরানী ব্রিজের কাছে, ৫ আগস্ট রাত বারোটোর পর। চারপাশে আতঙ্ক, আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ, দূরে ফ্লাইওভারের নিচে আগুনের লেলিহান। তিনি কোনো স্লোগান দেননি, কোনো গাড়ি পোড়াননি, শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, “এইসব দেখে রাখি, হয়তো একদিন মেয়েকে বলব এইখানে মানুষ দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের পাশে।” কিন্তু ইতিহাস তাঁকে নিজের পাতায় টেনে নিয়ে গেল একটি গুলি এসে তাঁর বুকে ইতিহাসের ছাপ ঐক্যে দিল।

নয় আগস্ট, বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, ধানমন্ডির এক প্রাইভেট হাসপাতালে শহীদ হন নয়ন। একটি শ্রমজীবী ছেলে, যে সারা জীবন দাঁড়িয়েছে অন্যের হয়ে দোকানের মালিকের হয়ে, পরিবারের জন্য সেই ছেলেটি এবার দাঁড়িয়েছিল দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে, হয়তো অজান্তেই। কিন্তু ফ্যাসিবাদের চোখে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই অপরাধ। আর এই দেশে, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় জন্মালেই গুলি লাগে বুকের মাঝখানে।

নয়ন কোনো রাজনৈতিক ক্যাডার ছিলেন না, ছিল না কোনো পোস্টার বা ব্যানারে নাম। কিন্তু তাঁর শরীরেই লেখা আছে একটি মুক্তি আন্দোলনের প্রারম্ভিকা। রাষ্ট্র তাঁকে চিনেনি, জানেনি, ছুঁয়ে দেখেনি। কিন্তু আমরা জানি সে রাত, সে গুলি, সে হাসপাতালের ধুলো সবই ছিলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষের

শেষ সাক্ষ্য।

এই আন্দোলন নয়নকে জন্ম দেয়নি কিন্তু তাঁর মৃত্যু আন্দোলনকে দিয়েছে আরেকটি নাম, আরেকটি মুখ, আরেকটি রক্তে লেখা সত্য। আজ যখন আমরা স্মরণ করি জুলাই বিপ্লবকে, নয়নের দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুহূর্তটিই আমাদের সবার দাঁড়ানোর শিক্ষা হয়ে থাকে শান্ত, দৃঢ়, বিপ্লবী।

শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি

“রাত বারোটোর দিকে কল পাই” একজন পিতার কণ্ঠে জেগে ওঠে মৃত্যুর পূর্বলিপি। এক অলক্ষ্য ফোন, এক অচেনা নম্বর, এক প্রশ্ন “আপনার ছেলে নয়ন?” তারপরই আসে অসম্ভব বাক্যটি: “সে পাঁচটা গুলি খেয়েছে।” বুক ফেঁটে কান্না আসেনি তখন, আসেনি হতবুদ্ধির থমথমে স্তব্ধতাও শুধু অন্ধকারে দৌড়ানো শুরু করেন বাবা নূর ইসলাম। রিকশা চালান যিনি, ঢাকার অলিগলি চেনা তাঁর ঘামের সোঁদা গন্ধে সেই মানুষটা এবার ছুটছেন মৃত্যুর ঠিকানার দিকে।

দুরানী ব্রিজের পাশে রক্তে ভেজা ছেলেটা পড়ে ছিল চেনা মুখ, অচেনা দেহ। নয়নের চোখ অর্ধেক খোলা, শরীর নিখর, কিন্তু তখনো নিঃশেষ হয়নি প্রাণ। পিতার কাঁধে তোলা, অটোরিকশায় ধাক্কাতে ধাক্কাতে হাসপাতালে নেওয়া এই পথ যেনো বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যার গেট সামনে বন্ধ, পেছনে রক্ত ঝরে।

হাসপাতাল প্রথমে নিতে চায় না। লাশ নয়, তখনো জীবিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভয়ের কাঁপুনি চিকিৎসকদের হাত কাঁপিয়ে দেয় তারা অপারেশন করেন বটে, দুটি গুলি বের করেন, বাকি গুলিগুলো শরীরের ভেতরে রেখে যায় এক মৃত্যুর রক্তচিহ্ন। উন্নতি হয়, আবার অবনতি। নয়নের ভাই হাসনাইন প্রতিটি মুহূর্ত ছিলেন পাশে, মৃত্যুর প্রতিটি ধাপের সাক্ষী হয়ে। হঠাৎ একদিন দুপুরে, ধানমন্ডির বেড়ে এসে দাঁড়ায় মৃত্যু। বলে, “চলো, এবার তোমার জায়গা এখানে নয়।” একটি পরিবারের জীবনের রুটির শেষ চাকা থেমে যায় সেদিন।

আজ নয়নের মা মমতাজ বেগম কান্না চেপে রাখেন মেয়ের সামনে, স্ত্রী আরজু বেগম চোখের জল লুকান মেয়ের চুল আঁচড়ে দিতে দিতে। আয়েশা জানে না, তার স্কুলজীবনের স্বপ্ন আজ একটি গুলির টানে থেমে গেছে। আর পিতা যিনি ছেলেকে কাঁধে তুলে এনেছিলেন একরাশ রক্তে তিনি আজো রিকশা চালান, কিন্তু হৃদয়ে বোঝা এখন অনেক ভারী।

নয়ন শহীদ হয়েছেন। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে ভোলার হাফিজ ইব্রাহিম কলেজের মসজিদের পাশে নীরব এক গলি, ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাখির ডাক। তবে শান্তি সেখানেও মেলে না। মৃত্যুর তিন মাস পর রাষ্ট্র আবার তাঁকে তোলে পোস্টমর্টেমের নামে, তদন্তের নামে, আবার একবার ছুঁড়ে দেয় মৃত্যুর গ্লানি। এই রাষ্ট্র শুধু হত্যা করে না, বারবার দাফন উল্টে গা ঘেঁষে ঘুম ভাঙায় মৃত্যুর।

নয়ন ছিল না কোনো উস্কানিদাতা, কোনো তাগুবকারী; তিনি ছিলেন এক পোশাকশ্রমিক, এক স্বামী, এক ভাই, এক পিতা এবং শেষমেশ, এক শহীদ। তাঁর শরীরের গুলির গর্তগুলো আজ বাংলাদেশের গৌরবের গহ্বর। রাষ্ট্র বলেছিল, “এই মাটিতে তোমার দাঁড়ানোর অধিকার নেই।” কিন্তু তাঁর কবর আজ সেই মাটিতেই শুয়ে বলে “এ মাটি আমারও, এ অধিকার রক্ত দিয়ে কিনেছি।”

এ মৃত্যু কেবল নয়নের নয় এ মৃত্যু এই রাষ্ট্রব্যবস্থার রক্তচাপ মাপার মেশিন হয়ে গেছে। আমরা যখন ভুলে যাই, তখন নয়নের লাশ আবার উঠে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করে, “তোমরা কোথায় ছিলে সেদিন?”

পরিবারের অবস্থা ও দাবি

নয়নের মৃত্যুর পর কেবল কয়েকজন মানুষ কাঁদেনি তার সাথে কেঁদেছে দেয়ালে ঝোলানো একটি পুরনো পাঞ্জাবি, খাবার টেবিলে চিরতরে খালি পড়ে থাকা একটি প্লেট, আর দোতলার বারান্দায় রোদ পোহানো এক জোড়া ছেঁড়া স্যান্ডেল। শহীদ নয়নের মৃত্যু এত নিঃশব্দ ছিল যে, কারও কানে পৌঁছায়নি কিন্তু এত গভীর ছিল যে,

একটি গোটা পরিবারের গলার স্বর চিরতরে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাঁর বাবা, এখনও যিনি রিকশা চালান আজিমপুর থেকে বনানী, ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল মারেন, মনে মনে ভাবেন “আমার ছেলে ছিলো, এখন একটা ফাঁকা জায়গা আছে।” নয়ন রোজ রাতে বাবার পাশে বসে চা খেতো, এখন সেই জায়গায় কেবল নীরবতা বসে থাকে।

স্ত্রী আরজু বেগম, যাঁর গলায় এখন আর সিঁথির সিঁদুর নেই, রোজ সকালে মানুষের বাসায় কাজের খোঁজে বের হন। কিন্তু একা নারী, একা জীবন, একা লড়াই সব এক করে দেয় সমাজের দৃষ্টিহীনতা। যাঁরা সহানুভূতি দেখানোর কথা, তাঁরা আজকাল মিটিং ব্যস্ততায় ডুবে থাকেন। না কোনো দল, না কোনো সংগঠন, না কোনো নেতা এসে বলেনি, “আপনার কষ্ট বুঝি।” কেন? কারণ নয়নের মুখটি কোনো পোস্টারে ছিল না। কারণ নয়ন কোনও ফ্রন্টলাইনার ছিল না। সে ছিল শুধু এক দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ না স্লোগান দিয়েছিল, না লাঠি ধরেছিল তবুও মরেছে। আর এই মৃত্যু বলে দেয়, কখনও কখনও দাঁড়িয়ে থাকাও অপরাধ হয়ে যায়। বড় মেয়ে আয়েশা, এখনো শিশু, শুধু জানে আব্দু একদিন গেলো, আর ফিরে আসেনি। সে কবরস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, “আব্দু, তুমি উঠো না কেন?” এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই, রাষ্ট্রও কোনো উত্তর দেয় না। ভাই হাসনাইন কাঁপা গলায় বলেন, “আমরা খুব কষ্টে আছি, শুধু খাই আর থাকি বাকি সব মরে গেছে।” একটি পরিবারের সমস্ত স্বপ্ন যেন জলাঞ্জলি গেছে রাষ্ট্রের নীরবতায়।

এই পরিবার রাষ্ট্রের কাছে করুণার ভিক্ষা চায় না তারা চায় ন্যায্যতা, তারা চায় বিচার, তারা চায় প্রাপ্য। প্রথমত, পরিবারটির জন্য নির্দিষ্ট মাসিক ভাতা চালু করা হোক, যাতে তাদের অন্তত ন্যূনতম জীবিকা নিশ্চিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, আয়েশার শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করুক, কারণ সে শহীদের রক্তের উত্তরাধিকারী।

তৃতীয়ত, ভাই হাসনাইন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক যেন তারা ভিক্ষা না করে, কাজ করে বাঁচতে পারে।

সর্বশেষ, তাঁদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করা হোক, কারণ কেবল দেয়ালের ছায়া থাকলেই ঘর হয় না তার জন্য লাগে নিরাপত্তা, সম্মান ও ভবিষ্যতের আশ্বাস। নয়ন নিজে একটিও দাবি করেননি জীবদ্দশায়, কিন্তু তাঁর মৃত্যু রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে গিয়েছে “তোমার চোখ কি কেবল তার দিকেই ফেরে, যার পেছনে পতাকা আছে?” যদি নয়নের মৃত্যুকে আমরা চুপ থেকে ভুলে যাই, তবে আমরা শুধু তাঁকেই নয়, নিজেদের মনুষ্যত্বকেও দাফন করি। এই পরিবারের পাশে দাঁড়ানো মানেই, নিজেদের বেঁচে থাকা মানবতাকে জাগিয়ে তোলা।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

শহীদের পূর্ণনাম : মো: নয়ন

জন্ম তারিখ : ০৫-০৪-১৯৯৮

পেশা বা পদবী : কারচুপির কাজ করতেন

পিতার নাম : মো: নূরুল ইসলাম

পিতার বয়স : ৬১ বছর

পিতার পেশা : রিকশা চালক

মাতার নাম : মমতাজ বেগম

মাতার বয়স : ৫৬ বছর

মাতার পেশা : গৃহিণী

পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৫ জন (পিতা, মাতা, এক মেয়ে ও দুই ভাই)

সন্তান : এক মেয়ে

স্ত্রী : আরজু বেগম

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মুলাইপতন, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর: মুন্সিরহাট

উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা

বর্তমান ঠিকানা : কামরাসীরচর, ঢাকা

ঘটনার স্থান : লালবাগ থানার পাশে দুররানি ব্রিজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

আঘাতকারী : পুলিশ

মৃত্যুর কারণ : "হত্যাকাণ্ড এবং "বন্দুকের গুলির আঘাতের কারণে" উল্লেখ করা হয়েছে।

আহত হওয়ার সময়কাল : ০৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ১২ টা

মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ০৯ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫:৩০ মিনিট; সুপারম্যাক্স হেলথকেয়ার লিমিটেড, ধানমন্ডি, ঢাকা

শহীদের কবরের অবস্থান : হাফিজ ইব্রাহিম কলেজ মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, ভোলা